নিন্দিত রবীন্দ্রনাথ

পার্থ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্মদিনে বিভিন্ন নামকরা মানুষের লেখা সম্বলিত একটি বই বেরিয়েছিল এবং তাঁকে বিশেষ সম্বর্ধনা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তাতে রবীন্দ্র-বিদ্বেষী বেশ কিছু মানুষ আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ কেন? আরও অনেক সাহিত্যিকের ৭০ বছর পেরিয়েছে। তাঁদের নিয়ে তো এমন কান্ড কখনও করা হয়নি?

আসলে বেশ কিছু মানুষ রবীন্দ্রনাথের এই প্রচন্ড খ্যাতি আর জনপ্রিয়তাকে সহ্য করতে পারতেন না। আমরা মনে করি রবীন্দ্রনাথ কী সুখী মানুষই ছিলেন! দেশের মানুষ তাঁকে কত ভালবাসা আর সম্মান জানিয়েছেন। দেশ কেন, বিদেশ থেকেও তিনি কত সম্মান ভালবাসা পেয়েছেন। আসলে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। সারা জীবন রবীন্দ্রনাথকে অনেক অবহেলা, অসম্মান, নিন্দা এবং অপমান সহ্য করতে হয়েছিল।

প্রথমতঃ পারিবারিক একটা প্রতিবন্ধকতা তো ছিলই। রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলাতেই তাঁর বাবা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহন করেছিলেন এবং তাঁর থেকেও বড় কথা তিনি তাঁর বাড়ির দীর্ঘদিনের পারিবারিক সব পুজো বন্ধ করেছিলেন। কারন তিনি মূর্তি পুজোর বিরোধী ছিলেন। ২০০ বছরের সাবেক কালের দুর্গাপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, দোলযাত্রা, রাসমেলা, সরস্বতী পুজো এমনকি বাড়ির লক্ষ্মীজনার্দনের নিত্য পুজোও বন্ধ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বাবার অর্থাৎ দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁর শ্রাদ্ধও হিন্দু মতে করেননি। বিশিষ্টজনেরা শ্রাদ্ধের দিন এসে দেখেন, শ্রাদ্ধের কোনো ব্যবস্থাই নেই। অবাক তো হয়েইছিলেন, কেউ কেউ অপমানিত বোধ করে ঐ বাড়ি ত্যাগ করে চলে যান। বাড়ির অন্য শরিকরাও যে আনন্দের সাথে এ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন ঠিক তা নয়। একটা চাপা ক্ষোভ অনেকের মধ্যেই ছিল।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সে সময় নিন্দুকের দল উঠে পড়ে গেল তাঁর লেখার নিন্দা করতে। এই সময়ে 'রবি রাহু শর্মা' নামে এক সমালোচক খড়্গহস্ত হয়ে গালাগালি দিতে লাগলেন। এই ভদ্রলোকটির আসল নাম কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করে রবিরাহু নামে একটা কবিতা লিখে ফেললেন। আরেক কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, 'কাকাতুয়া দেবশর্মা' নাম নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করার জন্য সাহিত্যের আসরে নামলেন। কালীপ্রসন্ন লিখলেন 'মিঠে কড়া' নামক কবিতা গ্রন্থ।

কালীপ্রসন্ন ছিলেন সেকালের এক নামকরা সাংবাদিক। তিনি বারো বছর ধরে 'হিতবাদি' নামক এক পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন এবং সাহিত্যের দরবারে তার বেশ ভালোরকম খ্যাতিও হয়েছিল। সালটা ছিল ১৮৮৮। মাস এপ্রিল। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 'কড়ি ও কোমল' কে ব্যঙ্গ করে 'মিঠে কড়া' নাম দিয়ে কবিতাগুচ্ছ প্রকাশ করলেন। কয়েকটি ছত্র উদাহরন দিই:

"ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ বঙ্গের আদর্শ কবি,
শিখেছি তাহারি দেখে তোরা কেউ কবি হবি?
আয় তোরা কে দেখতে যাবি
ঠাকুর বাড়ির মস্ত এক কবি
হায়রে কপাল হায়রে অর্থ
যার নাই তার সকল ব্যর্থ।
উড়িস নে রে পায়রা কবি
খোপের ভেতর থাক ঢাকা
তোর বক-বকম আর ফোঁসফোঁসানি
তাও কবিত্বের ভাব মাখা
তাও ছাপালি, গ্রন্থ হল
নগদ মূল্য এক টাকা।"

সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অন্য দিগন্ত রচনা করল। অসাধারন সেই গল্পগুলির কুৎসিত সমালোচনা শুরু হল। সমালোচনায় বলা হল, "গল্পগুলি শক্ত ও নিস্প্রাণ, ধোঁয়াটেও বটে। রবি বাবু এই গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে কী বলতে চাইছেন তা তো ধরাই মুশকিল। সাধারন পাঠক বুঝবেই না; হ্যাঁ, গম্ভীর গল্পে মহৎ ভাব মহৎ চরিত্র থাকা উচিৎ, তাই বা কোথায়? এই ধরনের গল্প লিখে সময় নষ্ট ও হিতবাদির পাতা নষ্ট করে কি লাভ? হাসির গল্প লেখাতেও কোনো বাধা নেই। তবে সেই হাসির ব্যাপার-স্যাপার গুলো বেশ মোটা দাগের হওয়া উচিত। সব ধরনের পাঠকের বোধগম্য হওয়া চাই তো।" রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। 'হিতবাদ' সম্পর্কে তার মনের চাপা ক্ষোভ ফুটে উঠেছে 'লেখার নমুনা' আর 'প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব' প্রবন্ধে। আসলে এই সমালোচকরা রবীন্দ্রনাথের গল্প ভালো করে পড়েননি এবং তাঁর গল্পগুলিকে অবাস্তব বলে প্রচার করেছেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে রবীন্দ্রনাথ তো শুধু কল্পনায় ভেসে ভেসে বেরিয়েছেন। আসলে ওঁর ব্যক্তিজীবনে কোনো struggle নেই। হাতে সবসময় প্রচুর সময়। মনে প্রানে উদ্ভট কবি। তার উপর আবার জমিদার মানুষ। তাই তার ছোটগল্পের চরিত্র গুলো আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রখ্যাত মানুষ বিপিনচন্দ্র পাল আরেক উক্তি করেছেন, - "রবিবাবুর ছোটগল্পে আরও কিছু বাস্তবতা আছে। কিন্তু সাধারন মানুষের দুঃখ দুর্দশার ছবিটা গোড়াতেই আসলে ফাঁকি। রবিবাবু নিজের জীবনে তো সেগুলি প্রত্যক্ষ করেননি, শুধু আরাম ভোগবিলাসের মধ্যে, কল্পনায় সাধারন মানুষের জীবনের চেহারা দেখেছেন। তাই গল্পগুলি মেকি, মিথ্যাচার ও ভন্ডামিতে ভরা।" রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প গুলি যে অসাধারন সৃষ্টি তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারেননি। তাই তাদের বক্তব্য, "রবিবাবু স্রেফ পোজ বা স্টাইল সর্বস্ব করে চালাকিতে পাঠককে ঠকাচ্ছেন।"

রবীন্দ্রনাথের গল্পের একজন বিশেষ সমালোচক ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি জন্মেছিলেন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে। পত্রিকা সম্পাদনা ছিল তাঁর একটা নেশা। ব্যক্তিজীবনে ইনি বিদ্যাসাগরের নাতি। তাঁর মা হেমলতা দেবী ছিলেন বিদ্যাসাগরের বড় মেয়ে। সুরেশচন্দ্রের বাবার নাম গোপালচন্দ্র ঘোষাল। সমাজপতি এঁদের পাওয়া উপাধি। একজন মানুষ সারা জীবন রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করে বিখ্যাত হয়ে গেলেন। অবশ্য আজকের সাহিত্য সমাজ তাকে সমর্থন তো করেই না, বরং তিনি ঠাট্টা-তামাশার পাত্র মাত্র। কিন্তু কেন যে তাঁর রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিদ্বেষ, তা আজও স্পষ্ট নয়। কোনো কোনো জায়গায় রবীন্দ্রনাথের সুখ্যাতি দু'একবার করেছেন, কিন্তু তা না করারই মতো। তাঁর সাহিত্য পত্রিকায় প্রবন্ধের নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি খুঁতখুঁতে ছিলেন। বহু লেখা ছাপতেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করে কেউ যদি অতি নিম্নমানের লেখা পাঠাতো, তা ছাপা হতই। রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

দেখে নেওয়া যাক, রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ গল্প সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির এতো রাগ। সাহিত্য, দ্বিতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যা, পৌষ, ১২৯৮ এ লেখা হল - "আমরা রবীন্দ্র বাবুর 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' পরিতে আরম্ভ করিয়া যেমন আমোদ পাইয়াছি, উপসংহারে তেমনই নিরাশ হইয়াছি। এই গল্পটির আরম্ভ-ভাগ অতি মনোরম, বেশ স্বাভাবিক। ইহার প্রাঞ্জল ভাষা ও সহজ অলঙ্কার গল্পটিকে আরও মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। আদুরে খোকার খামখেয়ালি মেজাজ কেমন স্বাভাবিক। কিন্তু যখন রাইচরন নিজের বুড়ো খোকাটিকে মুন্সেফ বাবুর সেই আদুরে খোকা বলিয়া আনিয়া দিতেছে, তখন আমাদের কেমন আস্বাভাবিক বোধ হয়। মুন্সেফ বাবু যেন গল্প সমাপ্ত করিবার জন্যেই সন্দেহ, সংশয় জলাঞ্জলি দিয়া পরের ছেলেকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। এইজন্য গল্পটি কেমন অঙ্গহীন, কষ্টকল্পিত বলিয়া বোধ হইতেছে।"

সাহিত্য, চতুর্থ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গল্প 'শাস্তি'। সমালোচনা হয়েছে, "গল্প লিখিয়া কাহাকে শাস্তি দিতে চাহেন বুঝিতে পারিলাম না। যদি পাঠককে শাস্তি দেওয়াই তাঁহার লক্ষ্য হয় তাহা হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে।" কালজয়ী আরেকটি গল্পের কথা বলি। গল্পটি বেরিয়েছিল সাহিত্য পত্রিকায় চতুর্থ বর্ষ অষ্টম সংখ্যায়, অঘ্রাণ, ১৩০০। গল্পটির নাম 'সমাপ্তি'। পরে এই গল্পটি নিয়ে বিশ্ববরেণ্য চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় অসামান্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। "স্বামীর প্রতি চিরবিরূপ মৃন্ময়ী কেমন করিয়া সহসা পতিপ্রেমাজ্ঞিনী হইল, গল্পে তাহার তথ্য পাওয়া যায় না। লেখককে প্রতি পদে কেন কেন করিয়া বিরক্ত করিতে পাঠকের স্বাভাবিক ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা আশ্চর্য হইবার মতো? রবীন্দ্র বাবু যদি কারণ ও ঘটনার সন্নিবেশ করিয়া মৃন্ময়ীর হৃদয়ের এই পরিবর্তন দেখাইতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁর গল্প সর্বাঙ্গ সুন্দর হইত। মৃন্ময়ীর হৃদয়ে পরিবর্তন লেখক সহসা স্বয়ং করিয়া দেওয়াতে গল্পটির মাঝখানটা কেমন খাপছারা আর অতৃপ্তিকর হইয়া গিয়াছে। গল্পটি ভালো প্রচেষ্টা হইলেও সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই। আমাদের উপদেশ হইতেছে উনি ছোটগল্প না লিখিয়া বরং কিছু ভালো কাব্য লিখুন।" তাঁর আরেক গল্পের কথা উল্লেখ করিতেছি। 'নিশীথে' - একটি ক্ষুদ্র গল্প। গল্পটির আখ্যান কৌশল অকিঞ্চিৎকর এবং ভাষার সৌন্দর্যে, বর্ণনার ঐশ্বর্যে গল্পটির প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এমন ভাষা এমন অলঙ্কার নিরর্থক ব্যয়িত হইয়াছে। লেখকের গল্পকৌশলের অভাবে এবং স্বভাব-সঙ্গতির দিকে দৃষ্টি না থাকায় গল্পটির মুন্ডপাত হইয়াছে। কিন্তু তাহার বর্ণনা ভঙ্গী ও সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রশংসা করিতে হয়।" আরেকটি গল্পের কথা উল্লেখ করি। গল্পটি বেরিয়েছিল সাহিত্য পত্রিকার নবম বর্ষে দশম সংখ্যা ১৩০৫ মাঘ সংখ্যায়। গল্পটির নাম 'মণিহারা'। সমালোচনা হল - "এটি একটি ক্ষুদ্র গল্প। আখ্যান বস্তু বৈচিত্রহীন। যে মাষ্টারের মুখে লেখক গল্পটির অবতারণা করিয়াছেন, সেই চরিত্রটির সঙ্গে মূল গল্পের কোনো সম্পর্ক নাই। গল্পে অবান্তর চরিত্রটি রেখাচিত্রে লেখকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির ও যথাযথ অঙ্কন নিপুনতার পরিচয় আছে। গল্পটির উপসংহার ঠিকমতো হল না।" এই হল রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সেকালের কিছু সমালোচনা। সমসাময়িক কালের বিশ্বের অন্যতম সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে সেকালের সমালোচকদের ব্যর্থ মূল্যায়ন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে অবশ্যই বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল কে নিয়ে নিজের মনগড়া একটি উপন্যাস লিখে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। বইটি ছিল একান্ত ব্যক্তিগত কুৎসা ও রবীন্দ্রনাথের চরিত্রহনন ও তার বংশে কালি মাখানোর চেষ্টা। নিম্নরুচি রসিকমহলে বইটি অত্যন্ত সুখাদ্য হয়ে উঠল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের সাহিত্য সংখ্যায় 'প্রণয়ের পরিণাম' নামে বড় কাহিনীটি ছাপানো হল। ঠাকুর বাড়িকে নিয়ে এমন রগরগে নোংরা গল্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরলেও সাহিত্যের ইতিহাস তাকে স্থান দেয়নি। রবীন্দ্রকুৎসায় এটি একটি মাইলস্টোন হয়ে থাকলো। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ২১শে জুন ১৮৯৯ শিলাইদহ থেকে একটি চিঠি - "ক্ষুব্ধ আত্মীয়দের পত্রে সংবাদ পাইলাম যে সাহিত্যের কোন গল্পে আমাকে অত্যন্ত কুৎসিত আক্রমন করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যদি তোমার কোন বন্ধুকৃত্য করিবার থাকে তো করিবে।" চিঠিখানি তিনি লিখেছিলেন প্রিয় বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে। রবীন্দ্রনাথের এই অপমান সেদিন এক তরুন সাহিত্যিক বরদাস্ত করতে পারেননি। তিনি কবির চেয়ে ১২ বছরের ছোট ছিলেন। তাঁর নাম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। 'প্রণয়ের পরিণাম' পড়ে ক্ষোভে ফেটে পড়া এই তরুণ 'প্রদীপ' নামে একটি পত্রিকায় কবিতায় একটি প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলেন। কবিতাটির শিরোনাম - 'একটি কুক্কুকরের প্রতি'।

চিরদিন পৃথিবীতে আছিলো প্রবাদ
কুকুর চীৎকার করে চন্দ্রোদয় দেখে
আজি এ কলির শেষে অপরূপ একি
কুক্কুকরের মতিভ্রম বিষম প্রমাদ
চিরদিন চন্দ্রপানে চাহিয়া চাহিয়া

এতোদিনে কুকুকর কি হইল পাগল
ভাসিছে 'নবীন রবি' নভঃ উজলিয়া
তাহে কেন কুকুকরের পরাণ বিকল?
নাড়িয়া লাঙ্গুল খানি ঊর্ধ্বপানে চাহি
ঘেউ ঘেউ ভেউ ভেউ মরে ফুকারিয়া
তবু তো রবির আলো ম্লান হল নাহি
নাহি হল অন্ধকার জগতের হিয়া।
হে 'কুকুকর ঘোষ' কেন আক্রোশ নিস্ফল
অতি ঊর্ধ্বে পৌঁছে কেন কন্ঠ ক্ষীনবল?

বেশ বোঝা যাচ্ছে কুকুকর ঘোষ বলতে হেমেন্দ্রপ্রসাদ কে লক্ষ করা হয়েছে। সেই সময় রবীন্দ্র বিদ্বেষীদের মধ্যে অনেকে বলেছিলেন যে হেমেন্দ্রবাবু তো কারও নাম উল্লেখ করে গালাগাল দেননি। তবে রবি বাবু ও তার চেলাদের এতো গাত্রদাহ কেন?

আসলে রবীন্দ্রনাথ কে বোঝার মতো ক্ষমতা এদের কারো ছিল না। এইভাবে এই সমালোচকের দল পরবর্তিকালে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তাই নিয়েই বিদ্রূপ আর গায়ে পরে ঝগড়া লাগানোর চেষ্টা করে গিয়েছেন। যেমন 'নষ্টনীড়','চোখের বালি'-র উদ্ভট সমালোচনা পরলে বোঝা যায় যে কত অগভীর চিন্তাধারা এবং সুথল রুচি নিয়ে তারা রবীন্দ্রনাথ কে বিচার করেছিলেন।

কবিতার বিচারের উদাহরন দিই। রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখলেন, - 'শেষ খেয়া', ১৩৯২ বঙ্গাব্দে।

"ঘরে যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘর পানে,
পারে যারা যাবার গেছে পারে;
ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।"

কালজয়ী এই বিখ্যাত কবিতাটি, জনপ্রিয় এই কবিতাটির সেকালের সমালোচকদের হাতে পরে কি দশা হোল জানেন? পত্রিকা থেকে উদৃধতি তুলে দিই।

"ঠিক অর্থহীন হেয়ালির মতো মনে হয়। আমরা রবীন্দ্রনাথের এই কবিতার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বোধ করি রচয়িতা ভিন্ন আর কেহ এই গোলকধাঁধার ব্যূহভেদ করিতে পারিবেন না।"

আবার দেখুন রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় -
"দিকে দিগন্তে যত আনন্দ
লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ"

এই ছত্রে সমালোচনা হয়েছে - "এই সব লেখা হইতে পারে অত্যন্ত মৌলিক কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থহীন। 'আনন্দের গভীর গন্ধ 'বোধ করি আকাশকুসুমের সৌরভের মত। প্রতিভাশালী কবি ভিন্ন অন্য কাহারও বোধগম্য নয়। রবীন্দ্রবাবু অনেক লিখিয়াছেন ,অনেক ছাপিয়েছেন ,অনেক গাইয়াছেন; এখনও যে তিনি যা -তা ছাপাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না ,ইহা আমাদের বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়। নাবালক কবিসুলভ কবিত্ব কনুডতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির পক্ষে নিতান্ত অশোভন। সে দৃষ্টান্ত সাহিত্যের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী। রবীন্দ্রবাবুর মত প্রতিভাশালী লেখকও যদি বুঝতে না পারেন তাহা হইলে আমরা নাচার। " আর এক সমালোচক রবীন্দ্রনাথের একটি গানের বিষয়ে লিখেছেন ,"যে বিনিদ্র রজনীর বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ভয়ঙ্কর। তখন বিশ্ব নিদ্রামগ্ন। অকস্মাৎ কে কবির বীণায় ঝংকার দিল এবং 'নয়নে ঘুম নিল কেড়ে।' -- -- -- তারপর কবি শয়ন ছেড়ে উঠিয়া বসিলেন। 'আঁখি মেলি চেয়ে থাকি 'তার দেখা পাইলেন না। কবি যে অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কেহ বুঝিতে পারিবে না। এ রোগ ! এ রোগে আঁখি মেলিয়া সারারাত্রি চাহিয়া থাকিতে হয়। কিন্ত ঘুমের দেখা পাওয়া যায় না। ইহা insomnia অর্থাৎ অনিদ্রা রোগের কথা।"

এইসব সমালোচকদের হাতে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কী দশা ! এখানেই শেষ নয়। আর এক জায়গায় লিখেছেন - "কিন্তু কবির insomnia বন্ধ্যা হইতে পারে তাই তাঁর 'গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া' প্রাণ উঠিল পুরে। অথচ কোন 'বিপুল বাণী ব্যাকুল সুরে' বাজিতে লাগিল তাহা কী বুঝিতে পারিলেন না।"

"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে
আমার সুরগুলি পায় চরণ আমি পাই নে তোমারে।"

রবীন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত গানটির সমালোচনা করা হয়েছে , "এতগুলি চরণ সত্ত্বেও গানটি যে খোঁড়া হইয়াছে তাহা হইতেই সব প্রমাণ হইতেছে। সুরগুলি চরণ পাইবামাত্র তাহাদিগকে ব্রহ্মসংগীতের ময়দানে ছাড়িয়া দিলেও কোনো লাভ নাই।" আবার "তুমি এত আলো জ্বলিয়াছ এই গগনে "গানটির সমালোচনা হয়েছে , "এই গানটির আদৌ জগতের আলো না দেখিলেও কোনো ক্ষতি ছিল না।"

১৯২০ সাল। রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে দ্বীজেন্দ্রলালের 'মন্ত্র ' বইটির ভূয়সী প্রশংসা করলেন - এত প্রশংসা খুব কম কবিকেই তিনি করেছেন। তিনি সুখ্যাতি করলেন বইটির বিষয়বস্তু ,ছন্দ ,ভাষা এবং তাঁর শুভ প্রচেষ্টাকে। সব চেয়ে বেশি করে তুলে ধরলেন তাঁর কাব্যে বলিষ্ঠ পৌরুষকে। ভক্তের দল হাতে চাঁদ পেলেন। তাঁরা তো এতদিন বলে বেড়াতেন যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য মেয়েলি ন্যাকামোতে ভর্ত্তি। তাঁর লেখা দেশের যুবসমাজকে নির্জীব , মেরুদণ্ডহীন একটি ক্লিব তৈরী করেছে। সে ক্ষেত্রে তিনি যুবসমাজকে দৃপ্ত হতে বলেছেন। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের থেকেও বড় কবি। সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "অবশ্য রবিবাবু প্রকারন্তরে স্বীকার করেই নিয়েছেন যে তাঁর নিজের লেখা মেয়েলি ও দ্বিজন্দ্রলালের লেখা ঋজু - পুরুষালি। তাঁর অধিকাংশ রচনায় ঢলাঢলি ভাব ও মেয়েলিপনা ফুটিয়াছে উহাতে ন্যাকামিও যথেষ্ট রহিয়াছে। " আসলে রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক ভাবনা ও গভীরতা ,সৌন্দর্য -কল্পনা এবং জীবন থেকে উত্তরণের এই অধ্যাত্বভাবনা তাঁদের মধ্যে ছিল না। তাঁর দুর্ভাগ্য তিনি এমন একটা যুগে জন্মেছিলেন যেখানে মানুষ শুধু সংস্কারে, গ্রাম্য ধর্মীয় বিশ্বাসে আচ্ছন্ন ,যেখানে মুক্ত বাতাস নিষিদ্ধ। কিন্তু কবি অল্পবয়সেই পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে পরিচিত এবং ব্রাহ্মধর্মের উদার আকাশকে ছুঁতে চেয়েছেন। সেকালের সমাজ কেমন ছিল তার কিছুটা সামাজিক চিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় এর ' নববাবু বিলাস 'ও 'নববিবি বিলাস ' এই দুটি বইতে। সেখানে দেখা যাচ্ছে , মা -বাবা অত্যন্ত চিন্তিত -" ছেলের বয়স হল অনেকটা। গোঁফের রেখা দেখা দিচ্ছে। কিন্তু এখনো মদ ধরলো না। বাঈজী বাড়ী যাবার নাম করছে না। লোকের কাছে মুখ দেখাতেও লজ্জা করছে।" এই ছিল উচ্চবিত্ত সমাজের চিত্র।

সেই যুগে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের যে রস সৃষ্টি করেছিলেন ,তা সত্যিই দুঃসাহসিক। তিনি যদি সমালোচকদের কথায় ভয় পেয়ে তাঁদের মতো সাহিত্য রচনা করতেন তো আমরা সত্যিকারের রবীন্দ্রনাথকে পেতাম না। তিনি বলতেন ---"আমাকে ঐ লেখার কথা ,ওদের সমালোচনার কথা শুনিও না। "

রবীন্দ্রনাথের অমর কালজয়ী সাহিত্যের এক দৃষ্টান্তকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কি জঘণ্য ভাবে চিত্রিত করেছেন তা পড়ে বিস্মিত হতে হয়।

"রবীন্দ্রনাথ অর্জুনকে কিরূপ জঘন্য পশু চিত্রিত করিয়াছেন দেখুন। একজন যে কোনো ভদ্র সন্তান এরূপ করিলে তাহাকে আমরা একাসনে বসিতে দিতাম না। অর্জুন একজন কুমারীর ধর্ম নষ্ট করিলেন। বর্ষকাল ধরিয়া একটি ভদ্রমহিলাকে সম্ভোগ করিলেন। আর তিনি যে সে ব্যাক্তি নহেন। তিনি অর্জুন। রাজপুত্র। .....রবীন্দ্রবাবুর হাতে পড়িয়া অনায়াসে একটি রাজকন্যার ধর্ম নাশ করিলেন। "আর এক জায়গায় লিখেছেন ,"আমি চিত্রাঙ্গদার সমালোচনা করিতে বসি নাই। ইহার ভাষা সুন্দর ও মধুর ছন্দোবদ্ধ। মাইকেলের পর এতো অমিত্রাক্ষর আর বোধহয় কেহই লিখিতে পারেন নাই। তথাপি এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত। " রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করিতে গেলে বাংলা কাব্য খুলিলেই ' দুজনে দেখা হল ','প্রতি অঙ্গ কাঁদে ,' 'সে চারু বদন , রচেছি শয়ন '- শুধু এই ই পাওয়া যায়। পবিত্র প্রেম ,যাহার মূলে সম্ভোগ নহে ,যাহার মূলে স্বার্থত্যাগ - সে প্রেম কি তাঁহার তিনটি কবিতায়ও আছে ? ' সোনার তরী 'কবিতার সমালোচনার উল্লেখ করা যায়। কবি নিজেই লিখেছেন , ' সোনার তরী ' আমার প্রথম রোম্যান্টিক কাব্যগুচ্ছ। সাহিত্যের ভাষায় এই রোম্যান্টিক শব্দটির অর্থ শুদু প্রেম নয়। একের মধ্যে বহুকে খুঁজে পাওয়াই রোম্যান্টিকতা। আর বহুর মধ্যে এক-কে খুঁজে পাওয়া হলো ' মিষ্টিক। ' এই 'সোনার তরী ' কাব্যের বিখ্যাত কবিতা ' গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা। 'এ কবিতা সকলের ই জানা। এর একটি চরণ ' কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা। ' দ্বিজেন্দ্রলাল এ কবিতার সমালোচনায় লিখেছেন ," রবিবাবু বলিতে পারেন বাংলা দেশের কোন চাষা বর্ষার আগে ধান কাটিয়া ফেলে ?অবশ্য আপনি বলিবেন ইহার মধ্যে একটি গভীর তত্ত্ব লুকাইয়া আছে। আপনি তো সোনার চামচ মুখে দিয়া জন্মাইয়াছেন। বাস করিয়াছেন রাজপ্রাসাদে , চাষ করিতে কখনো মাঠে নামেন নাই। আসলে ইহা একটি কবিতাই হয় নাই। "

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। এক সময় কিন্তু ঠাকুরবাড়ি সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের এই মনোভাব ছিল না। যথেষ্ঠ ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিছু স্তাবক দ্বিজেন্দ্রলালের কান ভাঙ্গিয়ে রবীন্দ্রনাথের নিন্দে করে তাঁকে খুশি করার চেষ্টা করতেন। সরল মানুষ দ্বিজেন্দ্রলাল দিনের পর দিন এই সব শুনে শুনে মানসিক দিক থেকে পাল্টাতে শুরু করেন। তবে এক সময় সত্যিই দু - জনের সম্পর্ক এতোই ভালো ছিল যে দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতা লিখে ,রবীন্দ্রনাথকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করেছেন। তিনি ছিলেন দাপুটে কবি, গীতিকার , গায়ক , সুরকার ও জনপ্রিয় শিল্পী। নাটকেও অত্যন্ত কৃতী মানুষ। একটা সময়ে ব্যক্তিত্বের সংঘাত দুজনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলো। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এ সব ব্যাপারে চির -উদাসীন। তিনি তার রচনাকে প্রতিযোগিতার উপকরণ করে কখনো রচনা করেননি। পন্ডিত দীনেশচন্দ্র সেনকে একটা চিঠিতে লিখেছেন ," আমার কাব্য সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা লইয়া বাদ -প্রতিবাদ করিবার কোনোই প্রয়োজন নাই। আমরা বৃথা সকল জিনিসকে বাড়াইয়া দেখিয়া নিজের মধ্যে অশান্তি ও বিরোধ সৃষ্টি করি। জগতে আমার রচনা খুব একটা গুরুতর ব্যাপার নহে। তাহার সমালোচনাও তথৈবচ। তাছাড়া সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ মত থাকে থাক না , সে তুচ্ছ বিষয় লইয়া কলহের সূচনা করিতে হইবে নাকি ? আমার লেখা দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভালো লাগে না। কিন্তু তাঁহার লেখা আমার ভালো লাগে। এতএব আমিই তো জিতিয়াছি। "

আর এক জায়গায় চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে লিখছেন— "তোমরা আমার লেখার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে যদি চেষ্টা কর, তবে একদল লোককে আঘাত দেবে। অথচ সে আঘাত দেবার কোন দরকার নেই। কেন না আমার কবিতা তো রয়েইছে। যদি ভাল হয় তো ভালই। যদি ভাল না হয় তো আর্বজনা দূর করবার জন্য ধোলাই খরচ লাগবেনা আপনি নিঃশব্দে সরে যাবে। যতদিন বেঁচে আছি নিজের নাম নিয়ে আর ধুলো ওড়াতে ইচ্ছে করিনে। চতুরদিকে বিদ্বেষের বিষ মথিত করে তুলো না।" রবীন্দ্রনাথকে ছোট করার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল দোষ খুঁজে বেড়াতেন। একবার রবীন্দ্রনাথের কাছে জানতে চাইলেন যে —

১. ঠাকুর পরিবারের লোকেরা এত অহংকারি কেন
২. ঠাকুর বাড়িতে অভিনয়ের সময় রবীন্দ্রনাথের লেখা নাটক কেন বেশি করে অভিনিত হয় ?

৩. আত্মজীবনি লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এত অহংকার দেখালেন কেন ?

৪. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্থানে অস্থানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে আডভারটাইস করেন কেন ?

৫. ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুর পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির যেমন দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের লেখা গান বেশি করে গাওয়া হয় কেন ?

সব শেষে লেখেন যে তিনি কারো তোয়াক্কা করেননা।

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয় সন্ন্যাস রোগে, আকস্মিক ভাবে। শোনা যায় মৃত্যুর আগে রবীন্দ্রনাথের কাছে নিজের কৃতকার্যের জন্যে ক্ষমা চেয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের ঘটনা যে তাঁর লেখা সেই চিঠি জলে ভেসে যাওয়ায় আর পাওয়া যায়নি। তাঁর "সেরিব্রাল হেমারেজ" হয় অর্থাৎ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের জন্য জ্ঞান হারান। সেসময়ে সবাই এসে মাথায় জল ঢালতে শুরু করে। শেই জলে জীবনের শেষ লেখা ওই চিঠি নষ্ট হয়ে যায়। শোনা যায় যে সেই চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে নিজের কৃতকার্যের জন্যে ক্ষমা চেয়েছিলেন। একথা জানিয়েছেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র দিলীপকুমার।

দ্বিজেন্দ্রলাল "আনন্দ বিদায়" নামে একটা প্রহসন লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করে। কিন্তু সেইটি অভিনয়ের সময় দর্শকরা স্টেজে উঠে ভাঙচুর করে প্রতিবাদ করে এবং দ্বিজেন্দ্রলালকে অপমান করে।

সেই সময়ে এত সমালোচক দল বেধে "রবিবাবুর" ত্রুটি ধরার জন্য উনুমখ হয়ে থাকতেন যে, সেই সময়ের সাহিত্যের পাতা খুললেই তা বোঝা যায়। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু। আজকের ইতিহাসের পাতায় যার নাম খুঁজেই পাওয়া কঠিন।

সেকালের বহু বিখ্যাত মানুষ রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে আক্রমণ করতেন। তাঁরা কিন্তু স্ব-স্ব ক্ষেত্রে রীতিমত বিখ্যাত ছিলেন। যেমন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁর সম্পাদনায় "নারায়নী" পত্রিকায় কবির বিরুদ্ধে অনেকে তাঁদের লেখা বেনামে লিখে প্রকাশ করতেন। সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুও কবির জন্ম শতবার্ষিকির সময় বিদেশের পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লিখেছেন যে তাঁর লেখা নাকি ভারতীয় ভাববাদের বক্তব্য নয়। তিনি নাকি আন্তর্জাতিক ভাবনায় দুনম্বর কার্বনকপি। অবশ্য এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন কবি বিষ্ণু দে। বুদ্ধদেব বাবুর বক্তব্য ছিল "Rabindranath's works are 'European Literature' in the Bengali Language".

সারা জীবন রবীন্দ্রনাথ এইভাবে সমালোচিত হয়েছেন বিশিষ্টজনদের কাছে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সজনীকান্ত দাস। আবশ্য পরবর্তীকালে নিজের ভুল বুঝতে পেরে পরম রবীন্দ্রভক্ত হয়েছিলেন তিনি। সজনীকান্ত দাস তাঁর শনিবারের চিঠি পত্রিকায় লিখেছেন, "যখন কবির ৭০ বছরপূর্তি উৎসবে যাবতীয় সাময়িক পত্র বিশেষ সংখ্যায় কবিকে সম্মানিত করিলেন তখনই আমরা ব্যজস্তুতির ছলে কঠোর রবীন্দ্র বিদূষণ করিয়া বসিলাম। শ্রী অমল হোম প্রমুখ রবীন্দ্রজয়ন্তীর উদ্যোক্তারা লক্ষ্য হইলেও সরাসরি রবীন্দ্রনাথকেও আঘাত কম করিলাম না। বিশেষ করিয়া তাঁহার ছবিকে 'ছবিতা' আখ্যা দিয়া যে সচিত্র ব্যঙ্গ রচনাটি (আমার রচিত, হেমন্ত চিত্রিত) আমাদের জয়ন্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইল, রবীন্দ্রনাথকে উত্তক্ত্য ও মর্মাহত করিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ছিল.... মোটের ওপর আমাদের প্রতিহিংসা পরায়ণতা শালীনতার সীমা ছাড়াইয়া গেল।" (আত্মস্মৃতি)

রবীন্দ্রনাথকে এমন কথাও বলা হয়েছিল যে, তিনি ব্রিটিশের কাছে টাকা খেয়ে 'চার অধ্যায়' লিখেছেন, স্বাধীনতা বিপ্লব কে ছোট করে দেখানোর জন্য। তিনি ব্রিটিশের ধামা-ধরা ছিলেন।

নারীমুক্তি আন্দোলনে 'স্ত্রীর পত্র' এক বলিষ্ঠ উদাহরন। এটি প্রকাশিত হওয়ার পর সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল। বলা হল যে তিনি বাংলার কুলবধূকে কুশিক্ষা দিচ্ছেন। ঘর গড়ার নয়, ঘর ভাঙার জন্য। কুলটা নারীর এতো জেদ কিসের? বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পাল 'স্ত্রীর পত্র' কে ব্যঙ্গ করে একটি গল্প লিখলেন -- 'মৃনালের কথা'। তাতে তিনি প্রমান করতে চাইলেন - মৃনাল স্ত্রীর পত্রে যা যা বলেছে তার সংসার সম্বন্ধে সবই মিথ্যে কথা, বানিয়ে বলা। মৃনাল দুশ্চরিত্রা বলেই নিজের স্বার্থের জন্য এই কাজ করেছে। তার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। লেখা হয়েছে রবি ঠাকুরই যত অনিষ্টের মূল। ওর লেখা পড়েই ভালো ভালো গৃহস্থ্য বধূ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নইলে মেয়ে মানুষের ঘটে এতো বুদ্ধি? ছি ছি ছি। স্বামীকে ছেড়ে চলে যেতে তার একটুও বাঁধলো না?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এলো সাহিত্য ও জীবনে বিবর্তন। এর ঢেউ এসে লাগলো দেশের সাহিত্যে, চিন্তাধারায়। রাজনীতিতে মার্কসবাদ এলো হামাগুড়ি দিয়ে।

এর মধ্যে যোগ দিলেন সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু। তিনি শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে বোঝাতে চাইলেন যে তাঁর যুগ শেষ হয়ে গেছে। নতুন লেখকদের রবীন্দ্রমোহ কাটিয়ে তাঁর দেখানো পথ থেকে সরে আসতে বললেন : "রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রতিভা আমাদের বুর্জোয়া সংস্কৃতির সমস্ত সৃজনশীল শক্তিকে আত্মস্থ করে তা প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছে। কোন কাব্যে অথবা গদ্যে যাঁরাই তাঁর অনুগামী তাঁরা তাঁকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে তাঁদের সাহিত্যকর্মের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন -- যে যুগ রবীন্দ্রনাথকে সৃষ্টি করেছে বহুদিন আগেই সে যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে।

আরেকজনের মন্তব্য তুলে ধরি। তিনি হলেন আরেক বাঙালী নীরদ চৌধুরী। "দুই রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "নোবেল প্রাইজ পাবার পর রবীন্দ্রনাথ এক উদ্ভট নকল ব্যক্তিত্যের সাজে সজ্জিত হয়ে সঙের অভিনেতায় পরিনত হন। একক, অন্তরমুখীন এমনকি নিন্দার্থে 'কুনো রবীন্দ্রনাথ' ছিলেন দেশী ও বাঙালী রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু নোবেল প্রাইজ পাবার পর হইতে তাঁহার জীবন দ্বিতীয় একটা খাতে বহিতে আরম্ভ করিল, ইহার ফলে বাঙালী রবীন্দ্রনাথ যে তিরোহিত হইলেন তাহা নয় কিন্তু দেশ ও বিদেশের উজ্জ্বলিত নাট্যমঞ্চে যে অভিনেতা দেখা দিলেন তাহার কাছে সত্যকার রবীন্দ্রনাথ ম্লান হইয়া গেলেন। বিশ্বমানবতা প্রচার, সুপরিসর আলখাল্লা পরিয়া বিদেশে ভ্রমণ, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা, বিদেশ হইতে ভারতীয় কালচারের বিদেশী ফেরিওয়ালা আনিয়া শান্তিনিকেতনে ইউরোপীয় চিড়িয়াখানার স্থাপন, উড কাঠ-বার্টিক প্রভৃতির বাতিক, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি সবই অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের কাজ, সত্যকারের রবীন্দ্রনাথের নহে।" এই নীরদ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়াকে কিছু মূল্য দিতে রাজি হননি বরং তাকে তুচ্ছ ঘটনা বলে দাবী করেছেন। তিনি লিখলেন যে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়াটাকে একটা সত্যকারের লাভ বলে গণ্য করে মস্ত বোকামি করে ফেলেছিলেন। কারন ওটি সত্যলাভ মোটেই নয়, উহা সম্পূর্ণ অলীক, কল্পিত লাভ। সবচেয়ে হাসির কথা নীরদ চৌধুরী লেখেন, "অভিনেতা হিসেবে বিশ্বের দরবারে লেডি ড্রেস পরিয়া থাকার ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবনে ব্যর্থতা ভিন্ন পূর্ণতা আসে নাই।"

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ বহুভাবে নিন্দিত হয়েছেন। তাঁকে বলা হয়েছিল ঔপনিবেশিকতার দালাল। এছাড়া বামপন্থীর দল resolution নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে সম্পুর্ণভাবে বর্জন করার দাবী তুলেছিল এবং সেই মিটিং এ স্বয়ং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ? তিনি এসব ব্যাপারে কি বলেছিলেন? তিনি বরাবরই নিজেকে খুব শান্ত রেখেছিলেন, তুচ্ছ হিসাবে গণ্য করেছিলেন। তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণে এবং অপপ্রচারেও নীরব থাকাই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। তবে তিনি যে এরজন্য কষ্ট পেয়েছেন একথা বহুভাবেই বলেছেন।

তাহলে দেখা যাক, দেশের মানুষ তাঁকে কি কি অপবাদ দিয়েছেন তাঁর তালিকা:
তিনি লম্পট, চরিত্রহীন, লোভী, জোচ্চোর, বেশ্যালয়ের টাউট, চোর, টুকলিবাজ, ঘুষখোর, মিথ্যাবাদী, ভন্ড, দু-মুখো, দু-নৌকোয় পা দিয়ে চলা মানুষ। তিনি আদতে মূর্খ, বিদেশী কালচারের ধামাধরা, তৈলদান করে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, "গোটা রবীন্দ্র সাহিত্য বাংলায় লেখা বিদেশী মাল। তাঁর সৃষ্ট কোন চরিত্রে এতটুকু মানবিকতা নেই। নাট্যকার হিসেবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পায়ের যোগ্যও নন। তাঁর ভাষা জগাখিচুড়ি ভাষা, তাঁর আঁকা কোন ছবিই ভালো ছবি নয়। তাঁকে বলা চলে - ছবিতা। তিনি বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল। তিনি উইল জালকারী। তিনি মেয়েলী, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি বীর্যহীন দুর্বল, ন্যাকামোতে ভর্তি। এই তালিকা পুরো করলে অনেক দীর্ঘ হবে। আর বাড়াবো না। বাকিটুকু বিচারের দায়িত্ব আপনাদের।

এই যে এতো উৎসব তাঁকে নিয়ে, দেশ-দেশান্তরে তাঁর জয়গান চলছে - একি শুধু একটা হুজুগ? একটা আবেগের উন্মাদনা?

আগামী ৫০ বছরে তাঁর অস্তিত্ব কোথায় দাঁড়াবে, তার মূল্যায়ন কি আমরা করেছি? দেশের জনগণ কি সত্যিই আগ্রহভরে তাঁর সাহিত্য পড়ে? রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ শ্রী অমিতাভ চৌধুরী দেখিয়েছেন যে, তাঁর লেখা ও সুর দেওয়া রবীন্দ্রসংগীতে মাত্র ৭০-৮০ টা গান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাওয়া হয়। জলসায় যেসব কবিতা আবৃত্তি করা হয়, রবীন্দ্র কবিতা বলতে এখনকার প্রজন্ম তাই জানে। তাঁর বিপুল সাহিত্য অপঠিত থাকে। তাঁর গল্প বা উপন্যাস টিভিতে বা সিনেমায় দেখে নেয়। সত্যি মনে হয় বিষ্ণু দে'র সেই কবিতার বিখ্যাত লাইন - "তুমি শুধু ২৫শে বৈশাখ আর ২২শে শ্রাবণ।"

১৯২৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর প্রেসিডেন্সি কলেজের এক সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, - "দেশের লোক, কাছের লোক। তাঁদের সম্বন্ধে আমার ভয়ের কথাটা এই যে, তাঁরা আমাকে অনেকখানি দেখে থাকেন, সমগ্রকে সার্থককে দেখা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পরে। আবার ১৯২৮ সালের ২৩শে অক্টোবর কবি অমিয় চক্রবর্তী কে লেখেন - "দেশের লোকের হাত থেকে অনেক দুঃখ অনেক মিথ্যা সহ্য করে এসেছি, এখন জীবনের প্রান্তে যখন এসেছি তখন তার চূড়া টা তৈরী হল। যে দেশে এটা সম্ভবপর হয় সে দেশে এই অভ্রভেদী অপমানের মন্দিরই আমার স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাক, আমি এর বেশী কিছু চাই না।"

এই ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা।

যিনি আমাদের পিতার অধিক পিতা, সখার অধিক সখা, যিনি আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির পথপ্রদর্শক, যিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন মাথা উঁচু করে চলার জন্য, যিনি আমাদের মাথার ওপরে মস্ত আচ্ছাদন, যিনি আমাদের জীবনে সুখে, শোকে, বন্ধুত্বে, প্রতি পদে, প্রেমে-প্রাণে-গানে, মনের পুলকে সর্বকালে আমাদের পাশাপাশি চলেছেন মহাকালের ঢেউ সরিয়ে -- তিনিই রবীন্দ্রনাথ। আমাদের আচার্য, আমাদের সখা, আমাদের প্রভু। কোন নিন্দা বা কোন ব্যর্থ সমালোচনা, কোন কটাক্ষ তাঁকে ছোঁয় না। যিনি মৃত্যুঞ্জয়, যিনি অসীম, যিনি শোককে জয় করেছেন অনায়াসে, যিনি এতো নিন্দাবাদে কখনো বিচলিত হননি, এতো সম্মানপ্রাপ্তিতে আহংকার করেননি কখনো, ভারতের সেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানকে আমাদের প্রণাম জানাই।

এই ১৫০ বছরে দূরত্ব তাঁকে যেন আরো কাছে নিয়ে এসেছে।

Partha Ghosh:
Eminent Poet , Orator , Writer, Dramatist. Legendary "Partho Ghosh Gouri Ghosh" Duo